হাঙর উপদ্রব রহস্য - অজেয় রায়
Hangor Upadrab Rahassa pdf by Ajeo Ray

বাঃ! চমৎকার।

মুগ্ধ চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে মন্তব্য করে সুনন্দ।

বলার মতোই দৃশ্য বটে। সামনে সুদূরবিস্তারী গাঢ় নীল সমুদ্র। সাগরের ঢেউ অবিরাম কলরোল করতে-করতে এসে আছড়ে পড়ছে ওই দ্বীপের তটভূমিতে। ঢেউগুলি ভাঙতেভাঙতে বেলাভূমিতে খানিক এগিয়ে ফেনার রাশি তুলে এলিয়ে পড়ছে। সমতল বালুময় সাগরতট বেশি চওড়া নয়। বড়জোর পঞ্চাশ মিটার। তারপর জমি উচু হয়ে উঠেছে ক্রমে। পিছনে দ্বীপের ভেতর খানিক উঁচুতে কিছুটা জায়গা সমান। সেখানে একটা তাবু খাটানো। রয়েছে। তাঁবুর পিছনে বড় একটা কুটির। কুটিরটির দেওয়াল ও মেঝে বাঁশের তৈরি। মাথায় টিনের ছাউনি। ঘরের সামনে টানা বারান্দায় বাঁশের রেলিং। পিছনে আরও উঁচু জায়গায় বেশ খানিক তফাতে ঘন সবুজ বন। আর কোনো মানুষের বসতি চোখে পড়ে না। কাছাকাছি। হ্যা, রয়েছে বটে মনুষ্যবাসের চিহ্ন। কিছু দূরে। পাশে। প্রায় আধমাইল তফাতে। উঁচু জমিতে সেখানে বনের কোল ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে একটি বাংলো ধরনের একতলা বড় বাড়ি। সেটিরও বাঁশের কাঠামো, টিনের চাল। অবশ্য ওই বাংলোয় কেউ রয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্তত বাংলোর বাইরে কোনো লোকের দেখা নেই।

সকাল প্রায় ন'টা। সাগরের গর্জন আর মাঝে-মাঝে সামুদ্রিক পাখির ডাক। ব্যস, আর কোনো আওয়াজ নেই। মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো ছিটে লাগা নীল আকাশ। সামনে সাগরে মাইলখানেক দূরে জল থেকে মাথা তুলে রয়েছে একটা কালচে পাথরের স্তুপ। অর্থাৎ, ওখানে জলের নিচে রয়েছে ডুবো পাহাড়।

সেই ছোট্ট নির্জন দ্বীপটির সৌন্দর্যে শুধু সুনন্দ নয়, মামাবাবু নবগোপাল ঘোষও কম মুগ্ধ হননি। তাদের ভাব দেখে ভরতের মুখও খুশি-খুশি।

খাসা জায়গা। এখানে দুটো দিন ভালোই কাটবে।মামাবাবুর কথায় সায় দেয় সুনন্দ, ভরতজি এই দ্বীপে অনেক টুরিস্ট পাবেন। আপনার ব্যবসা ভালো চলবে।

শুনে কিন্তু ভরতের হাসি মুখ মলিন হয়ে যায়। আমতা-আমতা করে বলেন, কী জানি বাবুজি। কেমন চলবে ব্যবসা? ঠিক বুঝছি না।

কেন-কেন? মামাবাবু সুনন্দ একযোগে প্রশ্ন করে অবাক হয়ে। সুনন্দ বলল, এমন সুন্দর পরিবেশ। একটু প্রচার পেলেই কত লোক বেড়াতে আসবে এখানে।

তা হয়তো আসবে।-আনায় ভরত, কিন্তু সমুদ্র তীরে যারা আসে তারা সমুদ্রে স্নান করতে চায়, সাঁতার কটিতে চায়। সে সুযোগ না থাকলে শুধু তীরে বসে সমুদ্র দেখায় ক'জনেরই বা মন ভরে ?

কেন এখানে সমুদ্রে স্নান করতে অসুবিধা কী? জিজ্ঞেস করেন মামাবাবু।

হচ্ছে বাবুজি। ভীষণ এক অসুবিধা। আগে তো বুঝিনি। কেউ বলেওনি বিপদ। এক ছেলে বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় পালেমবাং যেতে-যেতে এই দ্বীপে থামি। তখনই বুদ্ধিটা গজায় আমার। এখানে একটা ট্যুরিস্ট স্পট করলে কেমন হয়? সিঙ্গাপুর থেকে দূরে নয় বেশি।

বন্ধুও উৎসাহ দিল। পাঁচ বছরের লিজ নিলাম এই সমুদ্রতীরটা। ওই বাড়িটা বানালাম। তাবু, আর সব জিনিস কিনলাম ট্যুরিস্টদের এনে এখানে ক'দিন রাখতে। আমার স্ত্রী খুব ভালো রাঁধে। দেশি রান্না তো জানেই। অনেক বিদেশি রান্নাও শিখেছে। স্ত্রীও উৎসাহ দিয়েছিল এই ব্যবসায়। আমার বউয়ের এক বৃদ্ধা মাসি থাকে আমাদের কাছে। আমরা এখানে এলে মাসি আমাদের ছেলেমেয়েকে দিব্যি দেখাশোনা করতে পারবে ক'দিন।।

দু-পয়সা আয় হলে মন্দ কী? আমার জমা টাকা সব খরচা হয়ে গেল এখানের ব্যবস্থা করতে। কিছু ধারও হল। প্রথমে ভালোই চলছিল এই বাবসা। এখানে যখন বৃষ্টি কম হয়, তখনই যা টুরিস্ট পাই। সস্তায় সমুদ্রতীরে কাটানোর লোভে অনেক টুরিস্ট পেয়েছি গোড়ায়। নামকরা বেড়ানোর জায়গায়, ভালো হোটেলে থাকার খরচ অনেক। আমার এখানে খরচ ঢের কম। একটু-আধটু প্রচারও হচ্ছিল আমার এই ব্যবসার। কিন্তু এমন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। কী যে করি ভেবে পাই না?

—কীসের উৎপাত? সবিস্ময়ে জানতে চায় সুনন্দ।

ভরত কিন্তু-কিন্তু করছেন বলতে। যেন খোলসা করে বলতে সংকোচ। শুধু বিড়বিড় করলেন, সে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। আগে বলিনি আপনাদের। বললে হয়তো আসতেন না। মাপ করবেন আমায়। একজনও টুরিস্ট গাইনি তিন মাস। এখনও যে দেনা শোধ হয়নি। ভেবেছিলাম এখানে এসে বলব। না হয় আরও কিছু কম দেবেন।

মামাবাবু চুপচাপ গম্ভীরভাবে শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, চলুন ভরতজি, আপনার কটেজে যাই। রোদ চড়ছে গরম লাগছে। মনে হচ্ছে এখানে অল্প কথায় সব শোনাতে আপনার অসুবিধা আছে। বরং আপনার কটেজে গিয়ে শুনি সমস্যাটা কী?

—তাই চলুন। সম্মতি জানায় ভরত। তিনজন হাঁটা দেয় ভরতের কুটিরের দিকে। এই ফাকে ওই দ্বীপে আগন্তকদের পরিচয়টা জানিয়ে রাখি। মামাবাবু অর্থাৎ সুনন্দর মামা অধ্যাপক নবগোপাল ঘোষ বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী। বয়স মধ্য চল্লিশ। দোহারা অতি নিরীহ চেহারা। দেখে কে বলবে যে এই মানুষটি কীরকম অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। সুনদরও বিষয় প্রাণিবিজ্ঞান। সে গবেষণা করছে তার এই মামাবাবুর কাছে। দুজনেরই বাস কলকাতা শহরে।

মামাবাবু সুনন্দকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে। তিনদিন বিজ্ঞানের দুরূহ কচকচানি নিয়ে মাথা ঘামানোর পর স্রেফ দিন দুই ছুটি কাটাতে, আয়েস করতে, সেদিন সকালে এই দ্বীপে আগমন ভরত টুরিসম-এর ব্যবস্থাপনায়। দ্বীপটা সিঙ্গাপুরের কাছেই। রিও দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে ইঞ্জিন লাগানো নৌকায় মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ।

ভরত যাদবের বয়স প্রায় চল্লিশ। গাট্টাগোট্টা খাটো চেহারা। মুখে সরলভাব আদতে 'ভারতবর্ষের বিহার প্রদেশের লোক। পেটের দায়ে বাস করছেন সিঙ্গাপুরে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে এক গ্রাম সম্পর্কে কাকার হাত ধরে সিঙ্গাপুরে আগমন। দেশে তো জমিজায়গা নেই। দিনমজুরি সম্বল। কঠিন দারিদ্র্য। কাকা অনেককাল আছে সিঙ্গাপুরে। টুকিটাকি ব্যবসা করে কামাচ্ছে বেশ। কাকা ভরসা দিয়েছিল ভরতাকে, সিঙ্গাপুরে দেখবি। ঢের বেশি রোজগার করতে পারবি।

কাকার কথা মিথ্যে হয়নি। সিঙ্গাপুরে ভরত শিখেছেন কাঠমিস্ত্রির কাজ। চমৎক আসবাব তৈরি করেন। রোজগার হয় ভালোই। দেশে মা আর ছোট ভাই-বোননের উলে কিছু টাকাও পাঠান। বিহারে গিয়ে পাশের গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন। বছর সাত-আটের দুটি ছেলেমেয়ে আছে তাদের। ফুলে গড়ে। সিঙ্গাপুরে প্রচুর টাকি আসে। পর্যটন ব্যবসায় 'ভালো আয় হয়। রিও দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপে সেই রকমই ব্যবসা ফাদতে চেয়েছেন ভরত তার কাঠের কাজের পাশাপাশি। নবগোপালবাবুর হোটেলের এক কর্মচারী খোঁজ দেয় ভরতের। খুব কম খরচে থাকাখাওয়া আর অতি নিরালা জলে দ্বীপে দিনরাত কাটানোর আশ্বাস পেয়ে সুনন্দ এবং তার মামাবাবু চলে এসেছেন এখানে। মানে ভরত নিয়ে এসেছেন। দুই দেওয়া, ইঞ্জিন লাগানো, ভাড়া করা একটা জেলে নৌকায়। দু’জন মাঝি নৌকা সামলেছে। দ্বীপে পৌঁছে নৌকা তীরে তুলে রেখে মাঝি দু'জন চলে গিয়েছে অন্য কোথাও। দু-দিন বাদে এসে যাত্রীদের ফেরত নিয়ে যাবে সিঙ্গাপুর। ভরাতের সঙ্গে মামাবাবু ও সুন্দর কথাবার্তা চলে প্রধানত হিন্দিতে। ভরত কিছুটা ইংরেজি জানেন, বাংলাও জানেন অল্পস্বল্প।

ভরতের স্ত্রী আর ওদের কাজের লোক বছর কুড়ির ভগলু একদিন আগেই চলে এসেছে এখানে। অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে।

ভরত দ্বীপে পৌঁছেই ভগলুর সাহায্যে চটপট টাঙিয়ে ফেলেছেন মামাবাবু এবং সুনন্দর থাকার তাবু।

ভরতের কুটিরের বারান্দায় বসল তিনজন টুল পেতে। মামাবাবু বসেই কথাটা পাড়লেন, সমস্যাটা কী শুনি? বলুন ভরতজি। লজ্জা করবেন না।

ভরতের কথা শুরুর আগেই ভরতের স্ত্রী লালমতি বারান্দায় বেতের টেবিলে রেখে গেল তিন কাপ গরম চা এবং এক থালা গরম পকৌড়া। বোঝা গেল যে

ভরতদের আসতে। দেখেই সে তৈরি হয়েছিল আপ্যায়নে।

আঃ খাসা। পকৌড়ায় কামড় দিয়ে উৎফুল্ল সুনন্দ। ভরত বলতে শুরু করেন ধীরে-ধীরে।

জানেন বাবুজি, প্রথম মাস চারেক ভালোই চলেছিল এই ব্যবসা। কম পয়সায় থাকার কারণে বেশ কিছু পার্টি কাটিয়ে গিয়েছে এখানে। কখনও কখনও দুটো তাবু খাটাতে হয়েছে টুরিস্ট রাখতে। সবাই খুশি হয়েছে এখানে থেকে খেয়ে। কিন্তু শুরু হল। এক উৎপাত। এক ভয়ংকর ব্যাপার। আমার এখানের অতিথি কেউ সমুদ্রে স্নান করতে নামলেই খানিক বাদে এখানে জলে হাজির হয় হাঙর। একসঙ্গে অনেকগুলো। আক্রমণ করে জলে নামা মানুষদের। কী বলব, একেবারে তীর অবধি ধেয়ে আসে। ভয়ে মান করতে নামা সবাই উঠে পড়ে জল থেকে। জলের ওপর হাঙরের পিঠের তেকোনা পাখনা দেখলেই যে টের পাওয়া যায় ওগুলো আসছে এদিকে। এক আমেরিকান সাহেবের হাত কামড়ে জখম করে নিল হাঙর। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছে লোকটি। আর এক বামির টুরিস্টের পায়ে কামড় বসিয়েছিল। রীতিমতো জখম হয়। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এই রক্ষে।

লোক মুখে এই বিপদ চাউর হয়ে গেল। ভয়ে এখানে টুরিস্ট আসা একদম কমে গিয়েছে।

শুধু সমুদ্র দেখতে আর ক'জন আসে? বেশিরভাগ টুরিস্ট চায় সমুদ্রে স্নান করতে, সাতার কাটতে। আমার সব আশা লাটে ওঠার জোগাড় হয়েছে। এই বিপদের কথাটা জানিয়ে না রাখলে আমার পাপ হবে। জলে নামলে দোহাই খুব খেয়াল রাখবেন। হাওরের পিঠের পাখনা দেখলেই উঠে পড়বেন তীরে।

ওই এসে গিয়েছে। সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠেন 'ভরত, দেখুন বাবুজি, দূরে জলের ওপর হাঙরের পিঠের পাখনা দুটো।

ভরতের মুখে আর বাক্য জোগায় না। গভীর হতাশায় কপালে হাত রেখে মাথা নিচু করে থাকেন। মামাবাবু বললেন, এই উপদ্রব হঠাৎ শুরু হয়েছে?

—হ্যা তাই।

–আচ্ছা যখন আপনি এখানে কটেজ বানালেন তখন হাওয়া দেখেননি বেশি?

মানে।

তীরের কাছাকাছি।

–আচ্ছ, ওই কটেজটা কার? মামাবাবু ডানপাশে কিছু দূরে অন্য কটেজটি দেখান।

ওটা মিস্টার লির। চুংলি। সিঙ্গাপুরের ধনী ব্যবসায়ী। শখ করে বানিয়েছেন ওই কটেজ। বেড়াতে আসেন মাঝে-মাঝে। ছোট একটা লঞ্চে চেপে। ওর নিজের লঞ্চ।

একা আসে?

—কখনও একা। কখনও কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। হইচই ফুর্তিটুর্তি করে।

—লি বা তার বন্ধুরা সামনের সমুদ্রে স্নান করে ?

—তা করে। সাঁতারও কাটে।

—ওদের ওপর হাঙরের আক্রমণ হয়েছে কখনও?

—না। একবারও শুনিনি। দেখিওনি। আশ্চর্য! মামাবাবু ভুরু কুঁচকে কী জানি ভাবেন। অতঃপর বলেন, কখনও এমন হয়েছে কি, আপনার ট্যুরিস্ট এবং চুংলি বা তার লোকরা একই সময় সমুদ্রে নেমেছে। কিন্তু শুধু আপনার এলাকায় লোকদের ওপর আক্রমণ করেছে হাওর? ওদের কিন্তু করেনি।

ভরত বলল, 'আমরা এদিকে সমুদ্রে নামলে ওরা কনও সমুদ্রে নামে না। আমাদের অপছন্দ করে, তাই বোধহয়।

মিস্টার লির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো নয় বুঝি?

না। থতমত খেয়ে জানান ভরত।

- আসলে আমি এখানে টুরিস্ট আনি চায়নি লি। এখানে আমি টুরিস্ট আনলে ওর নাকি শান্তিভঙ্গ হবে। যখন কটেজটা বানাচ্ছি, আমায় শাসানির সুরে বারণ করেছিল এই ব্যবসা করতে। এমনকী আমায় বলেছিল, লিজ বাতিল করে দাও।

যদি ফাইন লাগে আমি দিয়ে দেব। কিন্তু, ওর হুমকিতে আমার জেদ চেপে যায়। লি সাহাবের কথা মানিনি। কটেজ বানাই। টুরিস্ট রাখার ব্যবসা চালাই। লি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না মোটে। বরং হুমকি দিয়েছে, আমার কেউ ওর এলাকায় ঢুকলে গুলি করবে। কিন্তু লির এলাকায় আমাদের ঢোকার দরকার কী? আমার টুরিস্টদেরও সাবধান করে দিই, ওর এলাকায় যেন একদম পা না দেয়।

—লির কটেজ কি অন্য সময় ফাঁকা পড়ে থাকে?

—না। একজন লোক বাংলো দেখভালো করে সারা বছর। এই দ্বীপে বিদ্যুতের বার নেই। তবে ওদের জেনারেটর আছে। দরকারে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে, ফ্যান ঘোরে কটেজে। মস্ত বড়লোক যে। আমার তো ইলেকট্রক আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করার সাধ্য নেই। আলো বলতে মোমবাতি আর হ্যাজাক বাতি ভরসা। তাই খুব কম পয়সা নিই ট্যুরিস্টদের থেকে। তবে আমার বউয়ের হাতের রান্না খেয়ে সবাই খুশি হয়। আপনার এই কটেজ কি ফাকা পড়ে থাকে টুরিস্ট না এলে? প্রশ্ন করে সুনন্দ।

—হ্যা। যাই বলা যায়। তবে গ্রামের একটি লোক মাঝে-সাঝে দেখভালো করে যায়। কিছু পয়সা নিই তাকে। গ্রাম! এখানে গ্রাম আছে?—সুনন্দ অবাক।

—আছে। ওই জঙ্গলের ওপাশে। উল্টোদিকে। ছোট্ট গ্রাম। জেলেদের। পুরুষরা বেশিরভাগ সময়ই কাজের ধান্দায় বাইরে থাকে। আমাদের নৌকার মাঝিরাও ওই গ্রামের লোক। ওরা গ্রামের বাসায় কাটাতে গেছে দুটো দিন। এ-পাশটায় গ্রামের লোক আসে খুব কম। কাছেই অঙ্গলের ভেতর একটা পুকুর আছে। সেখান থেকে জল এনে ধোয়ামোছা রান্নাবান্না করি। জল ফুটিয়ে খাই।

মামাবাবু বললেন, ধরুন আপনি এখানকার পাততাড়ি গুটোলেন। কিন্তু অন্য কেউ তো এসে এখানে ট্যুরিস্টস্পট বানাতে পারে? চুংলির শান্তিভঙ্গ করতে পারে। তখন?

সে সম্ভাবনা কম। আসলে এই দ্বীপে আসা-যাওয়ার বেশ অসুবিধে। কয়েকটা ডুবো পাহাড় 'আছে দ্বীপটার আশেপাশে। তাই জাহাজ বা বড় স্টিমার চলে না দ্বীপ ঘেঁষে। সিঙ্গাপুর থেকে যেসব জাহাজ বা স্টিমার সার্ভিস নিয়মিত যাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসা করে। সুমাত্রা, জাভা কিংবা আর কোথাও সেগুলো অন্য পথে যায়। এই জীপে আসা-যাওয়ার ভরসা। ছোট লঞ্চা বা নৌকা। তাই জাহাজ স্টিমার বা

এরোপ্লেন থামে যেখানে, তার কাছাকাছি বড় বড় ট্যুরিস্ট বেড়ানোর আস্তানা গড়ে উঠেছে। ভালো-ভালো হোটেল হয়েছে। এই দ্বীপের ওপর কারও নজর পড়েনি। তাই তো কম টাকায় জমিটা লিজ পেয়ে গেলাম।

ঠিক, ঠিক। চমৎকার নিরিবিলি। আমরা এমনি জায়গাই চেয়েছি। মামাবাবু উৎসাহ দেন ভরতকে, আপনি এখুনি হাল ছেড়ে দেবেন না। আপনার সমস্যাটা নিয়ে ভাবি একটু। দেখি কী করা যায়?

দুপুরের আহার হল খাসা। ভাত ডাল সবজি মাছভাজা চাটনি। সত্যি ভারতের স্ত্রীর ৰামার হাত অতি উত্তম। খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক তাবুতে ক্যাম্পখাটে শুয়ে বিশ্রাম নিয়েই মামাবাবু বললেন, সুনন্দ, চলো সি-বিচটা একবার ঘুরে দেখি। মামাবাবু ভরতকেও ডেকে নিলেন সঙ্গে।

ভারতের তাবুর সামনে সমুদ্রতট ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন। তখন ভাটার সময়। জল খানিক পিছিয়ে গিয়েছে। ভেজা বালির ওপর পড়ে রয়েছে কতরকম ঝিনুক। তড়বড়িয়ে দাড়া বাগিয়ে ঘুরছে ছোট-বড় কাঁকড়া। কাছাকাছি অনেকগুলি আকাশছোঁয়া নারকেল গাছ। গরম বেশ। এই জায়গার কাছ দিয়ে গিয়েছে নিরক্ষরেখা। তাই এখানে সারা বছরই গরম আবহাওয়া। যখন-তখন বৃষ্টি নামে বছরভর।

জলের ধার ঘেঁষে চুপচাপ ধীর পায়ে হেঁটে মামাবার চুংলির কটেজের দিকে চললেন।

পিছনে সুনন্দ ও ভাত। এক জায়গা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক পাথরের স্তুপ। ওই পাথরের সুপের মাঝামাঝি দিয়ে একটা সরু খাড়ি ঢুকে গিয়েছে। ভরত বললেন, এই খাড়িটাই আমার আর চুংলিসাহেবের জমির সীমানা। এপারে আমার, ওপারে চুংলির এলাকা।

সেই পাথরের ঝুঁপ দু-পাশে এবং পিছন দিকে ঢালু হয়ে মিশেছে দ্বীপের তটভূমিতে। নিশ্চয় এ কোনো ডুবো পাহাড়ের ডগা। ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে এই ঘড়ির সৃষ্টি, সৃপের নরম পাথর ভেদ করে। মামাবাবুরা তিনজন ঢাল বেয়ে সাবধানে ওই পাথরের সূপের মাথায় ওঠে। নিচে তাকায় খড়ির মধ্যে। খাড়িটা লম্বায় বিশ-পঁচিশ ফুট। ভেতরের অংশের পাড় খাড়া। কতটা গভীর বোঝা

গেল না। ভাটার সময়েও সেখানে জল এসে ঢুকছে। লির কটেজটা দেখা যাচ্ছে। তবে সেখানে কোনো মানুষের দর্শন মিলল না।

মামাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে খাড়ি-গর্ভে দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করেন 'ভরতকে, আচ্ছা, যখন আপনার টুরিস্ট জলে নামে, তখন কি লির কোনো নৌকা সমুদ্রে ভাসে?

কখনও-কখনও জানালেন ভরত।

—ওই যে খানিক দূরে জলের মধ্যে পাথরের স্তুপ দেখছি, ওর কাছে কি যায় তখন লির নৌকা?

না। ওই স্কুপের খুব কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। জলের নিচে পাহাড়ে ধাক্কা খাবে নৌকা। ডুবে যাবে।

-হুম। মামাবাবু আবার মন দিয়ে খাড়ির ভেতরটা দেখেন। দেখতে-দেখতে হঠাৎ স্থির দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে তিনি একটু নিচে নেমে যান পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে। তারপর সটান শুয়ে পড়েন উপুড় হয়ে ওখানে পাথরের ওপর অল্প একটু সমান জায়গায়। চাপা গলায় বলেন, সুনন্দ আমায় কি দেখা যাচ্ছে, চুংলির দিক থেকে?

এমনিতেই চুংলির এলাকায় শাড়ির পাড় মাঝে-মাঝেই ভরতের দিকের চেয়ে বেশি উঁচু। সুনন্দ তাই মাথা নেড়ে ইশারায় জানাল না।

এরপর মামাবাবু কঁাধের ব্যাগ থেকে বের করলেন একটা দূরবিন। দুরবিনে চোখ লাগিয়ে খাড়ির 'অপর দিকের খাড়া গায়ে দেখতে-দেখতে নিচু স্বরে বললেন, ভরতজি। আপনি এখানে নেমে আসুন তো গা ঢাকা নিয়ে।

মামাবাবু এরইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন সুনন্দকে, সুনন্দ তুমি ওপরে দাঁড়িয়ে নজর রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমায় সাবধান করে দিও।

ভ্যাবাচ্যাকা ভরত ধীরে-ধীরে নেমে মামাবাবুর কাছে গিয়ে বসলেন। মামাবাবু ভরতের হাতে দুরবিনটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন, ওইপাড়ে পাথরের গা দিয়ে একটা সরু দড়ি যেন নেমে গিয়েছে জলের ভিতর?

ভৈরত দূরবিন দিয়ে দেখে বললেন, হাঁ। তাই মনে হচ্ছে।

মামাবাবু বললেন, ওই দড়িটা এমনভাবে ঝুলছে যেন কিছু বাধা আছে দড়িতে, জলের তোড়ে তাই সরে যাচ্ছে না। ওই দড়িটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। কিছু বাধা আছে কিনা দেখতে চাই। কীভাবে করা যায়? নামতে পারবেন জলে?

খাড়ির ভেতর সাগর জলের উচ্ছ্বাস তখন বেশ স্তিমিত। তবু জলে নেমে ওপাশে গিয়ে দড়িটা আনতে সোনামনা করেন ভরত। বোধহয় হাঙরের ভয়ে। মামাবাবু ব্যাপার বুঝে বললেন, থাক। জলে নামতে হবে না। অন্য ব্যবস্থা করছি। তিনি তার ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বের করলেন পিচ বোর্ডের নলে জড়ানো সরু শক্ত সুতো আর বড়শির মতো 'ইঞ্চি দুই লম্বা একটা লোহার আংটা। মামাবাবুর কাধে ভোলো সর্বক্ষণের সঙ্গী ওই বড় ব্যাগটায় কত যে রকমারি জিনিস থাকে।

সুতো অনেকখানি খুলে মামাবাবু সুতোর ডগায় বাঁধলেন আংটাটা। তারপর পাক খাইয়ে ছুড়লেন সুতোটা। দু-দুবারের চেষ্টাতেও কিন্তু আংটা দড়িতে আটাল না। হতাশ মামাবাবু ভরতকে বললেন, — আপনি চেষ্টা করবেন নাকি?

এ ব্যাপারে ভরত অনেক বেশি দক্ষ। তার প্রথম ছোড়াতেই সুতোয় বাধা আংটা আটকে গেল দড়িতে। মামাবাবু টপ করে সুতোটা ভারতের হাত থেকে নিয়ে খুব সাবধানে সেটা টানতে লাগলেন কাছে। আংটায় লাগা দড়ি ক্রমে কাছে আসে। মামাবাবু বিড়বিড় করেন, বেশ ভারী কিছু বাধা আছে দড়িতে জলের তলায়।

দড়িটা এপাড়ের খুব কাছে এলে মামাবাবু সেটা গুটিয়ে তুলতে লাগলেন। সরু নাইলন। দড়ি। দড়ির ডগায় বাঁধা রয়েছে একটা বড় স্টিলের কৌটো-ফুটখানেক লম্বা। গোল আকার। মাথায় প্যাচ দিয়ে আটকানো ঢাকনা। ঢাকনার ওপর একটা ছোট আংটা। দড়িটা কৌটোর সেই আংটায় কয়েকবার পেচিয়ে শক্ত গিট দিয়ে বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত খাড়ির ওপাশে কোথাও আটকে রয়েছে। কৌটোর একদম ওপরের দিকে হোমিওপ্যাথির শিশির। সাইজের একটা ছোট্ট গোল ফুটো। কাত করতেই ফুটো দিয়ে একটু জল পড়ল।

মামাবাবু কৌটোর ঢাকনির পাট খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। খুব জোরে আঁটা। পিছলে যাচ্ছে হাত। তিনি কৌটোর ঢাকনি থেকে দড়িটা খুলে ফেললেন। ভরতকে বললেন, ওই কৌটোর ওজনের একটা পাথরের টুকরো বাধুন দড়ির মাথায়। তারপর জলে নেমে দড়িটা আগের মতো ঝুলিয়ে দিন ওধারে গাড়ির গায়ে। ভয় নেই। গাড়িতে হান্ডর নেই এখন। থাকলে ঠিক দেখা পেতাম।

ভরত মামাবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী পাথর বেঁধে দড়িটা খাড়ির অপর পাড়ে ঝুলিয়ে রেখে এল বটে। কিন্তু তার হাবেভাবে মনে হচ্ছিল যেন মামাবাবুর ভরসাতে বিশেষ আস্থা নেই। মামাবাৰু ইতিমধ্যে সেই কৌটোটা পুরে ফেলেছেন তার ব্যাগে।

ফিরে যেতে যেতে মামাবাবু প্রশ্ন করেন ভরতকে,আপনার টারিস্ট এলে চুংলির লোক কি খাড়ির কাছে এসে লক্ষ করে ?

—তা করে। খেয়াল করেছি কয়েকবার। ফিরেই মামাবাবু নিজের তাবুতে ঢুকে গেলেন। চা বিস্কুট পাঠিয়ে দিতে বললেন। সুনন্দ বুঝল, আপাতত মামাবাবু অন্য চিন্তায় মগ্ন। এখন তার গল্পগুজবের ইচ্ছে নেই।

ঘন্টাখানেক বাদে এলেন মামাবাবু। আর এসেই ঘোষণা করলেন, ভরতজি। কাল সকালে আমি একবার সিঙ্গাপুরে যাব। এই সাতটা নাগাদ রওনা হতে চাই। কালই ফিরতে পারি। নইলে পরশু। সুনন্দ, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি একা যাব।

শুনে সুনন্দ থ। তবে মামাবাবু এরকমই খেয়ালি মানুষ। প্রশ্ন করা তিনি পছন্দ করবেন না।

ভাত বেশ অবাক হয়ে বললেন, -বেশ। ভগলুকে গ্রামে পাঠাচ্ছি এখুনি, মাঝিদের খবর দিতে।

মামাবাবু বললেন, এই বাড়তি যাওয়া-আসার খরচ আমি পুষিয়ে দেব। মাঝিদেরও বকশিশ দেব।

মামাবাবুর পরের প্রশ্নটা অদ্ভুত, আচ্ছা ভরতজি চুংলির কটেজে কি মুরগি বা ছাগল পোষে?

–তা পোষে। কয়েকটা মুরগি আর ছাগল আছে। দুধ ডিম মাংস খায়।

সেদিন রাতে গরম-গরম আটার হাতরুটি, ডিমের কালিয়া আর পায়েস দিয়ে জমিয়ে খেল সবাই। আনমনা মামাবাৰু অবধি তারিফ করলেন, বাঃ! ভরতজি আপনার রান্নার হাত চমৎকার।

সুনন্দ খেয়াল করে, ভোররাতে মামাবাবু ভরতকে নিয়ে চলে গেলেন ঘড়ির দিকে। ফিরলেন খানিক বাদে। কী করতে গিয়েছিলেন তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। | সকাল সাতটা নাগাদ মামাবাবু সিঙ্গাপুর চলে গেলেন নৌকায়। যাওয়ার আগে তিনি সুনন্দকে বলে গেলেন, নজর রেখো চুংলির লোক ঘড়ির কাছে আসে কিনা। সমুদ্র স্নান একদম নয়। আর তোমরা কেউ ওই গাড়ির কাছে যেও না।

মামাবাবু চলে যেতেই সুনন্দ ভরতকে পাকড়ায়, ভোরে খাঁড়িতে কী করতে গিয়েছিলেন?

সেই কৌটোটা ফের দড়িতে বেঁধে আগের মতো গুলিয়ে রেখে এলাম। সারাটা দিন সুনন্দ একা-একা ঘুরে বেড়ায় দ্বীপে। বেলাভূমিতে কতরকম সামুদ্রিক জীব দেখল। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকল না। ধারে-ধারে ঘুরল। সেখানে বুননা আনারসের ঝোপ দেখে সে অবাক। ছোট-বড় প্রচুর আনারস ধারে রয়েছে। এক পাল ছোট আকারের বাঁদর ছিল বনে। অচেনা লোক কাছাকাছি ঘুরতে দেখে তারা কিচিরমিচির ডেকে বেজায় লাফঝাপ শুরু করে।

মামাবাবু সেদিনই ফিরলেন সন্ধের আগে। মুখ প্রসন্ন। অর্থাৎ যাত্রা বোধহয় সফল হয়েছে। পরের দিনও মামাবাবু ও সুনন্দ কাটাল ওই দ্বীপে। মামাবাবু স্রেফ তাবুতে বা তাঁবুর বাইরে বসে সমুদ্র দেখে কাটিয়ে দিলেন। তবে কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন। কারণ কথাবার্তা বলছিলেন খুব কম।

পরদিন মামাবাবু সুনন্দ ও ভরত দ্বীপ ছেড়ে নৌকায় পাড়ি দিল সিঙ্গাপুর। নৌকা নাকি আবার ফিরে এসে ফেরত নিয়ে যাবে মালপত্রসহ 'ভরতের স্ত্রী এবং ভগলুকে।

সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি পৌঁছেছে ভরতদের নৌকা। ওই সময় একটা ছোট লঞ্চ পাশ দিয়ে উল্টো দিকে বেরিয়ে গেল। ভরত বললেন, চুংলি সাহাবের লঞ্চ। বোধহয় ওই দ্বীপে যাচ্ছে।

মামাবাবু গম্ভীরভাবে আড়চোখে দেখলেন লঞ্চটা। সিঙ্গাপুরে ফিরেই মামাবাবুর ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি সেই প্রোগ্রাম বাতিল করে দিলেন। রায়ে গেলেন সিঙ্গাপুরের হোটেলে। কিন্তু ঘরে থাকতেন না বেশি। হরদম বেরিয়ে যেতেন। একা। সিঙ্গাপুরে কী করতে যে রয়েছেন মামাবাবু বোঝে না

সুনন্দ। সে বেচারি বাধ্য হয়ে সিঙ্গাপুর শহরে টহল মারতে লাগল। কখনও-কখনও ভরতের বাড়ি গিয়ে চা আর গরম পর্কৌড়া সাঁটায়।

-তৃতীয় দিন সকালে ভরত হঠাৎ হাজির হলেন হোটেলে, আমায় ডেকেছেন বাবুজি?

কিছু দরকার? আবার যাবেন নাকি এই দ্বীপে?

মামাবার বোধহয় ভরতের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, আসুন আসুন। নাঃ, এবার আর ওই দ্বীপে যাওয়ার সময় নেই। আপনাকে। ডেকেছি কটা খবর শোনাতে। খুব দামি খবর।

-খবর! কী খবর বাবুজি?

-এবার থেকে আপনি ওই দ্বীপে চুটিয়ে ব্যবসা করুন। ট্যুরিস্ট আনুন। তাদের সমুদ্রে স্নান করতে দেবেন নিশ্চিন্ত মনে। আপনার লোক জলে নামলেই যে হাঙরের উপদ্রব হত তা আর হবে না একদম। যতক্ষণ ইচ্ছে তারা স্নান করুক। সাঁতার কাটুক। মামাবাবুর কথা শুনে শুধু ভরত নয়, সুনন্দও হতভম্ব।

ভরত আমতা-আমতা করেন, ঠিক বলছেন বাবুজি?

ভরসা দিচ্ছেন?

—হা। পুরো ভরসা।

—আপনি কিছু কৌশল করলেন বুঝি?

তা বলতে পারেন করেছি। কী করেছি পরে জানতে পারবেন। এখন বলব না।

ভরত হাতজোড় করে মামাবাবুকে গদগদ স্বরে বলেন, আপনার বহুত মেহেরবানি বাবুজি।

কী কৌশল করলেন মামাবাবু হাঙরের উৎপাত ঠেকাতে? সুনন্দর মনে প্রচণ্ড কৌতুহল। কিন্তু ভরাতের সামনে প্রশ্ন করে লাভ নেই। মামাবাবু এখন চাইছেন না বলতে।

মামাবাবু হাসিমুখে বলেন, আর-একটা সুখবর দিচ্ছি। চুংলির হাল খুব খারাপ। ওই দ্বীপে ওর ডেরা ভেঙে গিয়েছে। আর ও আপনার সঙ্গে কামেলা করতে পারবে না।

—কী হয়েছে চুংলির? প্রশ্নটা যুগপৎ ভরত ও সুনন্দর।

—তাকে পুলিশে ধরেছে কাল। ফাটকে পুরেছে। চুংলি আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গকে। বিচারে বেশ ক'বছর জেল খাটতে হবে নির্ঘাত।

কেন? কী করেছে সে?

পরে ঠিক জানতে পারবেন। আমি যখন কিছু বলছি না। হ্যা, আমরা কাল সিঙ্গাপুর ছাড়ছি। আবার আসব বছরখানেক বাদে। তখন ওই দ্বীপে যাব। আপনার স্ত্রীর রান্না খাব। সমুদ্রে স্নানও করব।

খুশিতে ডগমগ ভরত বিদায় নিলেন।

ভরত চলে যেতেই উত্তেজিত সুনন্দ বলে, ব্যাপারটা খুলে বলুন মামাবাবু। ওখানে হাশুরের উপদ্রব আর হবে না কেন? চুংলিকে অ্যারেস্ট করেছে কেন?

মামাবাবু হেসে বললেন, রসসা বাপু, অত তাড়া দিও না। আগে এক কাপ চা খাই।

সুনন্দ উন্মুখ। চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু শুরু করেন, দেখ, হাঙরের উৎপাতের ব্যাপারটা শুনেই আমার মনে খটকা লাগে। কী ব্যাপার? শুধু ভরতের কটেজের সামনে। সমুদ্রে হাঙর আসে কেউ জলে নামলেই। অথচ চুংলির এলাকায় সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব হয় না? দুটো সাগর তো পাশাপাশি মেশামেশি। আর-একটা প্রশ্ন–ভরতের কেউ যখন সমুদ্রে নামে, চুংলির কটেজের কেউ তখন সমুদ্রে নামে না কক্ষনো। অর্থাৎ ওপক্ষক জানে যে এখুনি হার আসবে ওখানকার সমুদ্রে? তাহলে কি ইচ্ছেমতো হাঙর ডেকে আনা হয় ভরতের কেউ হলে নামলে? যদি তাই হয়, কে করে? উপায়ে?

—এই প্রশ্নগুলো আমার মনেও এসেছিল।

-আসা উচিত। খুবই স্বাভাবিক। আমার সন্দেহটা চুংলির ওপরেই পড়ে। কারণ ওই জীপে ভরতের পর্যটন ব্যবসায় তার ঘোর আপত্তি ছিল গোড়া থেকেই। ভরতকে ওখান থেকে সরাবার চেষ্টা করেছে। হুমকি দিয়েছে। মনে হল, এ নির্ঘাত চুংলির কর্তি।

—কিন্তু হাঙ্গর লেলিয়ে দিত কীভাবে? এ কি সম্ভব?

-হ্যা সম্ভব। আমিও প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না কা উপায়ে করছে। তবে ওই নিয়ে ভাবতে-ভাবাতে একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় আসে হঠাৎ রক্ত। তাজা রক্ত। জানো তো, হাঙরের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ওদের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। হার মাংসাশী হিংস্র প্রাণী। সমুদ্রজলে কোনো জীবের গা কেটে গিয়ে রক্ত বেরুলে হাঙর মাইলখানেক বা, আরও দূর থেকে সেই রক্তের গন্ধ পায় এবং শিকারের লোভে ওই রক্তের উৎস সন্ধানে ধেয়ে আসে। আমার মনে হয়েছিল ভরতের কেউ সমুদ্রে নামলেই চুংলির লোক কাছাকাছি সমুদ্রে ভরতের সি-বিচ ঘেষে তাজা রক্ত কিংবা তাজা রক্তমাখা মাংস খণ্ড ফেলে দেয়। সমুদ্রের জলে। তবে মাংস ফেললে 'তা খানিক বাদেই ঢেউয়ের তোড়ে তীরে এসে পড়বে। খানিকটা শুধু রক্ত ফেললেও তা স্রোতে দূরে সরে যাবে। খুব কাছে না থাকলে হাঙর ঠিক ভরতের এলাকার সমুদ্রে হামলা করতে আসবে না। স্রোতে ভাসা রক্তের গন্ধ অনুসরণ করে অন্য কোথাও চলে যাবে। চুংলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

পরে ভেবে মনে হল, আর-একটা উপায় হতে পারে। | চুংলির লোক হয়তো কোনো পাত্রে তাজা রক্ত ভরে সেটা দড়িতে বেঁধে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখে, ভরতের এলাকার সমুদ্রের কাছেই কোথাও। দড়ির অন্যপ্রান্ত ধাঁধা থাকে তীরে। পাত্র থেকে বেরোয় রক্ত। সমুদ্রের জলে মেশে। পাত্রটা তীরে বাঁধা থাকার জন্য ভেসে যায় না। ফলে কাছাকাছি বা বেশ দূরের হাঙর জলে ওই রক্তের গন্ধ পেয়ে রক্তের উৎস খুঁজতে খুঁজতে সাঁতরে চলে আসে ভরত এবং চুংলির সাগর এলাকায়। তাই তাজা রক্ত ভরা পাত্র জলে ডুবিয়ে রেখে চুংলির কেউ কদাপি সমুদ্রে নামে না। খানিক বাদেই হাঙরের আক্রমণ হবে জানে যে।

সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখা এমন কোনো কৌশল খুঁজতে-খুঁজতে সমুদ্রতীরে খাড়ির মধ্যে লুকনো ওই দড়ি বাঁধা কৌটোটা নজরে আসে। তোমরাও দেখেছ কৌটোটা। কৌটোর ঢাকনি তখন খুলতে পারিনি। তাঁবুতে গিয়ে খুলি। কৌটোয় অল্প জল ছিল। লালচে জল। কৌটোর ভেতরে কোথাও কোথাও ছিল কালচে ছোপ। কৌটোর জলে রক্ত আছে কিনা জানা দরকার। দ্বীপে মাইক্রোস্কোপ নেই।

তাই পরদিন সিঙ্গাপুরে চলে গেলাম পরীক্ষা করতে, কৌটোর জল শিশিতে পুরে কৌটোর ভিতরের গা টেচে কালচে ছোপের একটু স্যাম্পল নিয়ে। কৌটোটার ভিতরে গন্ধ শুকে আমি অবশ্য যাওয়ার আগেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, জলে রঙ মেশানো আর ওই কালচে দাগটা রক্তের। সিঙ্গাপুরে গিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলাম যে আমার আন্দাজ সঠিক। প্যাথোলজিস্ট ডক্টর তাকাহাসিও পরীক্ষা করে তাই জানালেন।

অথাৎ আমরা দ্বীপে আসার পরেই চুংলির লোক তাজা রক্ত ভরে কৌটোটা ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিল খাড়িতে। মুরগি ছাগল বা অন্য কোথাও প্রাণীর রক্ত। লুকিয়ে এসে টুক করে ফাঁদ পেতে পালিয়েছে। তখন সমুদ্রে নামলে কী হতে পারত বুঝেছ?

সুনন্দ বলে, খুব বুঝেছি। কৌটোর ফুটো দিয়ে একটু-একটু বেরিয়েছে রক্ত। সেই রক্ত মিশেছে খাড়ির জলে। সেখান থেকে রক্ত মেশা জল গিয়েছে সামনের সমুদ্রে। হাঙরের টোপ। খানিক বাদে আমরা কেউ জলে নামলেই হাঙরে ধরত। সেদিন দেখলামই তো, হাঙর এসে গিয়েছিল কাছাকাছি। বাপরে খুব বেঁচে গিয়েছি।

মামাবাবু বললেন, এই কায়দাই করছিল চুংলি, ভরতের ট্যুরিস্ট জলে নামলে। এবারও আশা করেছিল, আমরা একটু বাদেই সমুদ্রে নামব।

সুনন্দ বলে, কিন্তু মামাবাবু চুংলিকে পুলিশে ধরেছে কেন? ওকে অনেক বছর জেল খাটতে হবে কেন ? রক্তের ফাঁদ পেতে ভরতকে জব্দ করার দুর্বুদ্ধি, ওই দ্বীপে ভরতের ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা অপরাধ নিশ্চয়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ নয়। এর জন্যে ফাইন করতে পারে, সতর্ক করে ধমকধামক দিতে পারে আদালত। বড়জোর কিছুদিন জেল খাটা। কিন্তু অনেক বছর জেল খাটার মতো অপরাধ কি? জানি না অবশ্য এদেশের আইনকানুন!

মামাবাবু বললেন, ঠিক বলেছ, ভরতকে ওহ জব্দ করার চেষ্টা মোটেই তেমন বড় অপরাধ নয়। তা প্রমাণ করাও শক্ত। চুংলি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেক বছর জেল খাটতে হবে অন্য কারণে। ঢের গুরুতর অপরাধ।

-কী রকম?

-জানো, ভরতকে ওই দ্বীপ থেকে তাড়াবার এই অভিনব ফন্দি আবিষ্কারের পর আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। ভরত কী এমন অসুবিধে করছিল চুংলির? ভরত তো মাঝেসাঝে অল্প ক'জন ট্যুরিস্ট নিয়ে যায়। কয়েকদিন মাত্র থাকে। বেশি লোকের ব্যবস্থা করার সাধ্যি নেই ভরতের। ওই জংলা দ্বীপে বেশি ট্যুরিস্ট যাবেই বা কেন? থাকবেই বা কেন বেশিদিন? এর জন্যে এত মাথাব্যথা কেন চুংলির? নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। চলে গেলাম আমার পরিচিত সিঙ্গাপুরের এক পুলিশ কর্তার কাছে। খুলে বলি সব। পুলিশ কর্তাটির মনেও খটকা লাগে। সন্দেহ হয় কিছু। আমরা যেদিন এই দ্বীপ ছাড়ি তার পরদিনই পুলিশ ফোর্স হানা দেয় ওই দ্বীপে। একেবারে হাতেনাতে ধরে শয়তান চুংলি আর তার কয়েকজন সাকরেদকে।

-কেন কেন?

–চোরাই মাদকদ্রব্য রাখার অপরাধে। ওই দ্বীপ ছিল চুংলির ঘাঁটি। দ্বীপে ওর বাংলোয় মাটির নিচে কুঠুরিতে পাওয়া গিয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশার বস্তু। হেরোইন আরও কী-কী। ওখান থেকে সুবিধেমতো নানা জায়গায় ওইসব মাদক পাচার করত। ওটাই ছিল চুংলির টাকা কামাবার আসল কারবার। পাছে ভরত কিছু টের পেয়ে যায় তাই কায়দা করে তাড়াতে চাইছিল ভরতকে। আচ্ছা কৌশল করেছিল বটে। ঘটনাটা শিগগির খবরের কাগজে বেরুবে। তখন সবই জানতে পারবে।ওঃ এই ব্যাপার! সুনন্দ স্তম্ভিত।

সমাপ্ত